দৈনিক খবর

৪

তারিখ 11 SEP 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

২০০০ সালে'র সব পেয়েছির দেশের স্বপ্ন

পান্থ

আমরা দু'হাজার সালের দিকে বুকভরা আশা নিয়ে তাকিয়ে আছি অথবা বলা চলে আমাদের স্বপ্ন আছে ২০০০ সালে আমরা সব পেয়েছির দেশে পৌঁছে যাবো। এই বাংলাদেশ। পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের চেয়ে কিছুটা বেশী এলাকা জুড়ে অবস্থিত ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ সেদিন তার সব আকাঙ্খার পরিপূর্ণ বাস্তবতা নিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

হ্যাঁ, এ কথাই আমরা অন্ততঃ দশ বছরের উপর থেকে শুনে আসছি। আমাদের রোগ-ব্যাধি আছে। শোনান হলো ২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য। জাতিসংঘ সেই লক্ষ্যে পৃথিবীর সকল দেশের প্রতি ডাক দিয়েছে ২০০০ সালে সবারই স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান কর। হাসপাতালের অভাবে, ডাক্তারের অভাবে রোগের চিকিৎসা হচ্ছে না। ওষুধ মিলছে না এমন অবস্থা আর থাকবে না। উন্নত অনুন্নত উন্নয়নশীল নির্বিশেষে সকল দেশই কথা দিয়েছে- হ্যাঁ ২০০০ সালে আমরা সবার জন্য স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করবো। আমাদের দেশেও সে কথা শোনা গিয়েছিল।

আমার বেশ মনে আছে, ১৯৮৫ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে এক ডাক্তারের সংগে আলাপকালে জিজ্ঞাসা করেছিলেম যে, আপনি কী বিশ্বাস করেন আমাদের সদিচ্ছা বাদে কিংবা রূঢ়ভাবে বলতে গেলে শ্লোগান বাদে কিছু অর্জন করা সম্ভব। তিনি বললেন না, ২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে অন্ততঃ প্রচেষ্টাও নেই। তবে লোককে স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমরা সচেতন করতে পারি। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যাবে না ঠিকই। কিন্তু বিশুদ্ধ পানি পান করলে পানিবাহিত রোগের সংক্রমণতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, এ কথাটা বলতে পারবো।

কিন্তু এই সচেতনা সৃষ্টির জন্য চাই শিক্ষা। আর শিক্ষার ক্ষেত্রেও শ্লোগান উঠেছে ২০০০ সালে সবার জন্য শিক্ষা। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিবছর আমরা মহাসমারোহে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করি।

এখানেও শ্লোগানের অগ্রগতি আছে। অগ্রগতি হয়েছে সভা-সেমিনারের। বয়স্ক শিক্ষার উপর নজর দেয়া হয়েছে। কারণ, অনেক লোকই নিরক্ষর। এদের যদি সাক্ষর করে তোলা যায়, তবে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা কমবে। এখন প্রতি ৪ জনে ৩ জনই নিরক্ষর বাংলাদেশে। বয়স্কদের অ আ ক খ শিখিয়ে তা কমানোর চেষ্টা চলছে। বয়স্ক লোক যারা শৈশবে লেখাপড়া শিখতে পারেনি, এখন দিনান্তে হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনির পর পড়াশুনায় কেন মনোযোগ দিবে। না, মুখে মুখে হিসাবটায় ভুল হতে পারে। কিংবা কেউ তার জমিটা বেহাত হতে পারে- একটা ভুল দলিলের মাধ্যমে। এই তো ৮ই সেপ্টেম্বর রাতে টিভি'র দিকে এক ঝলক চোখ ফিরাতে গিয়ে দেখলাম ছেলে শহর থেকে নিরক্ষর বাপের কাছে চিঠি দিয়েছে তার চাকরি হয়েছে, নিরক্ষর বাপ গ্রামের একজন টাউটের কাছে চিঠিটা পড়িয়ে নিতে গেল। সে বললো, তাকে ২০০ টাকা দিতে হবে। এটা সে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পত্রটি পড়াতে গিয়ে জানতে পারে। টাউট লোকটা কী পড়িয়ে শুনিয়েছিল, তা আর টিভি'র পর্দায় দেখিনি। কারণ, ওই সময়টা টিভি'র অনুষ্ঠানের দিকে মনোযোগ ছিল না। অবশ্যই বয়স্কদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু সেখানে যেসব অসুবিধা- সেই একই অসুবিধার জন্য শিশুকালে সে পাঠশালায় যায়নি। গাচে গাছে পাখীর ছানার খোঁজই করেনি, বাজানের সংগে মাঠে গিয়েছে। কাজেই বয়স্ক শিক্ষার সুযোগটা এদিক থেকে সীমিত। এখন সারা দেশে বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্র যতগুলো আছে, তারা সাফল্যের সংগে বয়স্কদের শিক্ষা দিতে গেলে কমপক্ষে একশ' বছর লাগবে। আর এই বয়স্কদের মধ্যে বেশীর ভাগ দশ-পনের বছরেই পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নেবে। দারিদ্র্য তাদের আয়ু একটা নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধেদিয়েছে।

কাজেই সাক্ষরতার উপর প্রধান জোর দেয়া উচিত গোড়া থেকে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। এ দাবী ছিল ২১ দফার অন্তর্গত। সেই ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের দাবী। তারও আগে কৃষক প্রজা পার্টি ১৯৩৬ সালে ঢাকা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবেই অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার দাবী করেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশেও সেই কথাটা বলা হয়েছে। এখন বাংলাদেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৩৫৮৮টি। এটা ১৯৮৭ সালের পরিসংখ্যান পুস্তিকায় আছে। ছাত্রসংখ্যা এক কোটি ৭ লাখের কিছু উপরে। পাঁচ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা আড়াই কোটির মতো। বাংলাদেশে গ্রামের সংখ্যা ৬৮ হাজার।

তাহলে দু'হাজার সালে সবার জন্য শিক্ষা কীভাবে সম্ভব? এই ধাঁধাঁর উত্তর কি কেউ দিতে পারবেন? সাক্ষরতা সম্পর্কে এবারও বেশ কিছু নিবন্ধ বিভিন্ন সেমিনারে পড়া হয়েছে। তাতে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

দু'হাজার সাল কতদূরে? মাত্র ১০ বছর আছে মাঝখানে। এই বিপুল নিরক্ষরতা দশ বছরে পার হবার মতো কোন যাদুকাঠি কী কারুর কাছে আছে? কেউ বলছেন যে, সাক্ষরতা সফল করার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু একটি রাজনৈতিক দল তো ক্ষমতায় আছে। তাদের সিদ্ধান্ত কি? তারা বলছেন যে, শিক্ষাখাতে দেখছ না রেকর্ড পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করছি। আগের কোন সরকার করেনি এতো অর্থ বরাদ্দ। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, অতীত সরকারের নিন্দাবাদের মধ্যেই সব ক্ষমতাসীন সরকার সাফল্য দেখতে পায়। এই ট্র্যাজেডী থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি বলে কোন ক্ষেত্রেই আমরা এক হয়ে কাজ করতে পারছি না। সরকারী প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে হবে, এটাই রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে এক ধরনের। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিলমিশ দেখি। সরকারী বাজেটের প্রশংসা যেসব প্রতিষ্ঠান করেন, তাদের অনেকের রাজনৈতিক আদর্শ এক নয়। অথচ বিরোধী দলের মধ্যে একই আদর্শের অনুসারীদের ভিন্ন মত পোষণ করতে দেখি। অর্থাৎ বিরোধিতাও গৎবাঁধা, সমর্থনও গৎবাঁধা। এভাবে সুস্থ সমালোচনার ধারা গড়ে ওঠে না। ফলে সহিষ্ণুতার অভাবও এ জন্যই রাজনীতিতে চোখে পড়ে।

চোখের উপর দেখছি, আমরা যেভাবে চলছি- তাতে ২০০০ সালে সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবো না। সুতরাং যেটুকু পারবো ততটুকু হাতে নেব, এ রকম মনোভাব নিলে দেখা যাবে শিক্ষার অগ্রগতি হবে। নিরক্ষরতা দূর না হলেও কমবে।

আর আগের কাজ আগে করা ভাল। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা থেকেই দেখা গেছে যে, বহু গ্রামে কোন স্কুলই নেই। সরকারী পর্যায়েই হোক আর বেসরকারী পর্যায়ে হোক বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির মহাসচিব অধ্যাপক ওসমান গনি বলেছেন, ৩২০০০ গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই। সরকার প্রথমে ঠিক করুন ২০০০ সালের মধ্যে অন্ততঃ ৩২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যাবে কি-না। গ্রামপ্রতি একটি স্কুল স্থাপন করেই অন্ততঃ ওই গ্রামের সকল শিশুকে না হোক অর্ধেক শিশুকে তো স্কুলে নিয়ে আসা যাবে। সে ব্যাপারে চুপ করে থেকে লাভ নেই। বিরোধী দল থেকে বলা হয় যে, তারা ক্ষমতায় গেলে কাজটা করতেন। খুবই আশার কথা। কিন্তু প্রকৃত সত্যটা এই যে, তাদের এমন কোন কর্মসূচী নেই, যার চরিত্র মৌলিক এবং বর্তমানে যেভাবে দেশ চলছে তা ১৯৭৫ সালের পর গৃহীত অর্থনীতির রূপরেখা ধরেই চলছে।

১৯৭৫ সালের আগের অর্থনীতিতে কিছুটা মৌলিকত্ব ছিল ঠিকই। তা অনুসরণ করা হলে দেশের অবস্থা কী দাঁড়ায় তা নিয়ে বিতর্ক করার যুক্তি নেই। বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ সম্পর্কেদ যে কথাই বলা হোক না কেন, আমাদের অবস্থা দর কষাকষির পর্যায়ে নেই। সেই ধরনের অবস্থা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা কার্যতঃ অনুপস্থিত।

শিক্ষাঙ্গনের দিকে তাকালেই এ কথার সত্যতা বোঝা যায়। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের নিন্দা করে সকল রাজনৈতিক দল, অথচ ছাত্রদের হাতে অস্ত্র কীভাবে আসে তা কারুর অজানা নয়। সকলেই পরস্পরকে দোষারোপ করছে, কিন্তু নিজের ভূমিকার সংগে অপরের ভূমিকার কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। একজন শিক্ষক ক্ষোভ আর হতাশায় মন্তব্য করেন- একটি ছাত্রের পিছনে বিশ/ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হয় কি শিখবিদ্যালয়ে অস্ত্র ব্যবহার শিখানোর জন্য না জ্ঞানের জন্য তা বোঝার উপায় আজ নেই। প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা আছে। আছে যখন তখন গোলগুলী করে নিজেদের অবস্থান শক্ত করারচেষ্টা।

এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে, আর অস্ত্রের ঝংকারে শিক্ষাঙ্গন মুখরিত। রোজই খবর থাকছে, অমুক কলেজে সংঘর্ষ, অমুক সংগঠনের ছাত্র আহত কিংবা গুলীবিদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্রকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। ধরে হাত কেটে দেয়া হয়েছে। ছাত্র নামধারী খুনীদের সনাক্ত করার পর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়নি। অস্ত্রসহ ছাত্র ধরা পড়লে তার মুক্তি দাবী করা হয়। মুহূর্তে ব্যাপারটা রাজনীতিতে পরিণত হয়। এ রকম রাজনীতিতে সাক্ষরতা দিবসের লক্ষ্যে সার্থক করার জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রহসনের মত শোনায়।

তবু আমরা দু'হাজার সালের দিকে চেয়ে আছি। কোন অলৌকিক উপায়ে সেই সব পেয়েছির দেশে পৌঁছে যাব। আশায় লোক বাঁচে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই আমরা বেঁচে আছি। সাক্ষরতা দিবসের সভা-সেমিনার সত্য। আগামী স্বপ্নটা সত্য নয় শুধুসান্ত্বনা!